জামে তারিখে হিন্দ অবলম্বনে রচিত

খিলজি শাসন

[খিলজি বংশ কর্তৃক ভারতবর্ষ শাসনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস]

হুসাইন আহমাদ খান

বাতায়ন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি

ফিরোজ খিলজির সিংহাসনে আরোহণ ১২
সুলতান জালালউদ্দিনের আবেগ ও অনুভূতি ১৩
মালিক ছুজুর বিদ্রোহ ১৫
সুলতান ফিরোজের মহত্ত্ব ১৭
সুলতান ফিরোজের সামরিক অভিযান ১৮
রণথম্বোর অভিযান ২০
সুলতান জালালউদ্দিন ও সিদি মাওলা ২১
আলির ষড়যন্ত্র ২৩
সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজির হত্যা ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন খিলজি : ক্ষমতা অর্জন

দিল্লি দখল ৩০
সিংহাসনে আরোহণ ৩৩
মুলতান ৩৬
কাদিরের আক্রমণ ও জারান মুঞ্জুর যুদ্ধ ৩৭
পুরাতন আমিরদের বরখাস্ত ৩৭
গুজরাট জয় ৩৮
সিজিস্তান ৪১
আলাউদ্দিনের নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও সিকান্দার সানি উপাধি প্রসঙ্গ ৪২
কুতলুগ খাজার আক্রমণ : কেলির যুদ্ধ ৪৩
রণথম্বোর বিজয় ও তিনটি বিদ্রোহ (১২৯৯-১৩০০) ৪৭
আকাত খানের বিদ্রোহ ৪৯
মালিক উমর ও মাঙ্গু খানের বিদ্রোহ ৫১
হাজি মাওলার বিদ্রোহ ৫১

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

বিদ্রোহ বন্ধের পদক্ষেপ ও করব্যবস্থা সংস্কার

চিতোর বিজয় ও তুরগির হামলা (১৩০১-১৩০৩)

বিদ্রোহ বন্ধের চার পদক্ষেপ..... ৫৬
১. সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ..... ৫৬
২. গোয়েন্দা বিভাগ গঠন ৫৭
৩. দিল্লিতে মদ নিষিদ্ধ..... ৫৮
৪. আমিরদের প্রতিরোধ ৫৮
সুলতান ও হিন্দু সর্দার..... ৫৯
আলাউদ্দিনের কর-সংস্কার..... ৬০
ওয়ারাঙ্গল আক্রমণ, চিতোর বিজয় ৬২
তুরগির দিল্লি অবরোধ..... ৬৫
পদ্মিনীর কাহিনি ও আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে চিতোর অঞ্চল..... ৬৬

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ৭০
শস্য বাজার..... ৭২
ঘোড়া, ক্রীতদাস ও গবাদি পশুর বাজার ৭৫
সাধারণ বাজার..... ৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

শেষ মোঙ্গল আক্রমণ—মালওয়া ও রাজস্থান বিজয়

আলি বেগ, তারতাক ও তুরগির আক্রমণ..... ৭৯
কুবিক, ইকবাল, মুদবার ও তাইবোর আক্রমণ..... ৮০
মালওয়া বিজয় ৮১
সিওয়ানা বিজয় ৮২
জালুর বিজয়..... ৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাক্ষিণাত্য এবং আরও দক্ষিণ অঞ্চল

বাঙ্গালা জয় : দেবগিরিতে দ্বিতীয় হামলা ৮৫
দোল রানি ৮৭
ওয়ারাঙ্গল অভিযান ৮৮
দ্বারসমুদ্র ও মুবার অভিযান ৯১

সপ্তম অধ্যায়

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

শেষ কয়েক বছর

একটি গণহত্যা ৯৫
খিজির খানের বিয়ে ৯৫
দেবগিরিতে মালিক কাফুর ৯৭
আল্প খানের হত্যা, খিজিরের উত্তরাধিকার বঞ্চিতকরণ ও কারাবাস ... ৯৭

অষ্টম অধ্যায়

সুলতান শিহাবউদ্দিন উমর : মালিক কাফুরের শাসন

নবম অধ্যায়

সুলতান কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ খিলজি

সিংহাসনে আরোহণ ও প্রাথমিক নীতি ১০৩
হাসান বারদু ও সুলতানের নৈতিক অবক্ষয় ১০৪
গুজরাট-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ১০৬
দেবগিরিতে মোবারকের বিজয়ী আক্রমণ ১০৮
ওয়ারাঙ্গালের দ্বিতীয় অবরোধ ১০৯
আসাদউদ্দিনের ষড়যন্ত্র ও মোবারকের কঠোরতা ১১০
মালিক ইয়াক লাখির বিদ্রোহ ও মুবারে খসরু খান ১১২
সুলতান ও শায়েখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ১১৫
সুলতানকে হত্যা ১১৬

দশম অধ্যায়

নাসিরউদ্দিন খসরু খান

খসরু খানের সিংহাসনে আরোহণ ১১৯
সংঘাতের উৎপত্তি ১২১
সরস্বতীর যুদ্ধ ১২৩
লাহরাওয়াতের যুদ্ধ ১২৪

ফিরোজ খিলজির সিংহাসনে আরোহণ

১২৯০ সালের জুন মাসে শায়েস্তা খান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি ক্ষমতায় বসেন। এটি ছিল শুধু রাজপরিবারের পরিবর্তনের চেয়েও বেশি কিছু। পঁচিশ বছর আগে সুলতান বলবনের সিংহাসনে আরোহণের বিপরীতে এই পরিবর্তনটি ছিল একটি যুগের অবসান। কেননা, এতে মামলুক রাজবংশ বিলুপ্ত হওয়ার পাশাপাশি সেই বংশপরম্পরাও শেষ হয়ে গিয়েছিল—যা ছিল সুলতান কুতুবউদ্দিন আলতামাশ ও তার উত্তরসূরিদের রাজনৈতিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য। তুর্কিরা[১] তাদের অজেয় বাহিনী দিয়ে বিজয় শুরু করেছিল এবং শত্রুদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু একইসাথে তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বংশীয় পক্ষপাতিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিল। এমনকি সর্বজনীন খেলাফতের আনুষ্ঠানিক অধীনতা তুর্কিদের চরিত্রকে নামমাত্র প্রভাবিত করতে পেরেছিল। দিল্লি সালতানাতকে সাধারণ একজন তুর্কির ক্ষমতা দিয়ে তার বাগডোর এমন কিছু লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়েছিল, যারা মোঙ্গলদের আক্রমণ ও পরিবেশগত প্রভাবের কারণে সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা দিনের পর দিন কঠিন মনে করছিল। শেষ পর্যন্ত সুলতান বলবনের শাসনামলে তাদের বিরোধী পক্ষকে নির্মূল করার জন্য অবলম্বন করতে হয়েছিল বিপজ্জনক পদ্ধতি।

খিলজি বংশ—যা সাধারণত অ-তুর্কি বলে বিবেচিত হয়[২]—তাদের সহজ বিজয় এই সত্যকে নির্দেশ করে, বংশগত স্বৈরাচার রাষ্ট্রকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। কেননা, এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে নতুন শক্তি এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল—নতুন উপায়ে 'শাসনব্যবস্থা' ঢেলে সাজাতে হবে। বিজয়ের সময়ের প্রভাবশালী পদ্ধতি (Improvisation) অন্তর্নিহিত বিভাজন-প্রবণতার জন্য আর প্রতিকার দিতে পারেনি। রাষ্ট্র সম্প্রসারণের নীতির চেয়ে একটি নিয়মিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি আদর্শ ও নতুন সমাজ।

---

১. অর্থাৎ 'মামলুক বংশ'। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে তাদেরকে 'মামলুক বংশ' বলে অভিহিত করা হলেও তারা মূলত ছিলেন উচ্চবংশীয় তুর্কি। জন্মগতভাবে তারা কেউ ক্রীতদাস ছিলেন না। দেখুন, তবাকাতে নাসিরি : ১৩৮।—আহমাদ খান

২. এই মত পোষণ করেছেন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি। কিন্তু ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন ও কাসেম ফিরিশতার মতে, খিলজিরাও তুর্কি বংশোদ্ভূত।—আহমাদ খান

সুলতান জালালউদ্দিনের সমঝোতামূলক মেজাজ এই নতুন কর্মসূচির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। ক্রান্তিকালকে যথাসম্ভব সহজ করার জন্য এবং পরাজিত শহরগুলোর তুর্কিদের সম্মানের কথা বিবেচনা করে তিনি দিল্লিতে প্রবেশ স্থগিত করেন। এজন্য তিনি নিজের দরবার স্থাপন করেন কিলোঘেরি-তে কায়কোবাদের অসমাপ্ত প্রাসাদে। এরপর যখন শাসনক্ষমতা পুনর্গঠিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আত্মীয়স্বজন ও সমর্থকরা দখল করে নেয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো। একইসাথে পুরোনো আমিরদের একটি বড় অংশকে এড়িয়ে যাওয়া হয় বুদ্ধিমত্তার সাথে। বলবনের বন্ধু, দিল্লির বিশিষ্ট নাগরিক ফখরউদ্দিনকে রাজধানীর কোতওয়াল হিসেবে বহাল রাখা হয়। খাজা খাতির বহাল থাকেন মন্ত্রীর পদে। সুলতান ফিরোজ খিলজি কারা ও পুলোনির গভর্নর পদের জন্য মালিক ছুজুর অনুরোধ মেনে নেন। সেখানে সুলতান বলবনের সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যেতে দেওয়া হয়। সুলতানের আত্মীয়দের মধ্যে তার ভাই ইয়াগরিশ খানকে সামরিক মন্ত্রিত্বের পদ দেওয়া হয়। তার ভাতিজা হাবিব আহমদ চপ হন ভাইস রেজিস্ট্রার।

সুলতান জালালউদ্দিনের আবেগ ও অনুভূতি

এভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই আমির ও মালিকদের ঘৃণা ও শত্রুতা পরিণত হয় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায়। যখন তারা সুলতানের স্বাভাবিক নমনীয়তা এবং তার বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতির কথা জানতে পারেন—যেমন বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বর্ণনা করেছেন, শুরুতে পুরস্কার ও পদের লোভে লোকেরা শান্তি স্থাপনের জন্য সংকোচের সাথে তার কাছে আসে; কিন্তু সুলতানের আন্তরিকতা দেখে আস্তে আস্তে তারা স্বাভাবিক ও শান্ত হয়। তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, যখন তারা সুলতানের মাঝে খুঁজে পায় একজন অতুলনীয় শান্তিপ্রিয় ও দয়ালু ব্যক্তিকে—যিনি তার সত্তর বছর বয়স পেরিয়ে এসেছিলেন এবং যার একমাত্র ইচ্ছা ছিল, একজন ধার্মিক মুসলমানের মতো আল্লাহর খেদমতে অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কয়েক মাস পর দিল্লিতে সুলতান জালালউদ্দিনের প্রথম সরকারি সফর উপলক্ষে যখন তিনি প্রকাশ্যে তার মানবিক আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন এই লোকেরা এটাকে কিছুটা অপ্রীতিকর মনে করতে থাকে। ক্ষমতার নেশায় মত্ত তার আত্মীয়দের বিরক্তির শেষ ছিল না—যখন তিনি লাল মহলের গেটে ঘোড়া থেকে নামার জন্য জোর দেন। এমনকি তিনি কর্মকর্তাদের সংরক্ষিত আসন ব্যতীত রাজদরবারে অন্য কোনো স্থানে বসতেও নিষেধ করেন। এ ব্যাপারে হাবিব আহমদ চপের আপত্তির জবাবে তিনি বলেন, 'সুলতান বলবনের সামনে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতাম! সুলতান বলবন ছিলেন

আমার মনিব। সুতরাং নিজের মনিবের মহলের স্মৃতিময় স্থানগুলোর ইজ্জত রক্ষা করা প্রত্যেক গোলামের ওপর ফরজ।'

আবেগে কাবু হয়ে তিনি চিৎকার করে প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, 'দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে আমাকে শাসনভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এর মাধ্যমে আমি বাধ্য হয়েছি নিজ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়দের ভবিষ্যৎ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিতে। কেননা, আমার মতো অপরিচিত বংশের একজন মানুষ কিছু অনুসারীসমেত কীভাবে সালতানাত আগলে রাখতে পারে এবং এটাকে নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়ার আশা করতে পারে? অথচ প্রবল প্রতাপশালী সুলতান বলবনের মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তার খান্দানের হাতছাড়া হয়ে গেছে এই সাম্রাজ্য!'

এ ধরনের আবেগ ও অনুভূতি একটি সাদাসিধা ও খাঁটি হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যা শাসনক্ষমতার লোভে দূষিত হয়নি এবং যা শিশুদের মতো দুর্বোধ্য বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে আনন্দবোধ করে। এজন্য সহজ-সরল ও অরাজনৈতিক জনগণের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন দরবেশ শাসক। কেননা, সাম্রাজ্যের সংবিধানকে তার হৃদয়ের অনুভূতির অধীন করে দিয়ে পূর্বের স্বৈরশাসকদের থেকে তিনি নিজেকে পূর্ণাঙ্গ ও পছন্দনীয় পন্থায় সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য করে নিয়েছিলেন। সম্ভবত তার রাজত্ব প্রচলিত 'রক্ত-লৌহ' শাসননীতির প্রতি সচেতন আপত্তির একটি প্যাটার্ন উপস্থাপন করে। যেমনটি ঐতিহাসিক বারানি ইঙ্গিত করেছেন, 'দুর্বল হৃদয়ের সুলতানের কোনো দোষ ছিল না যে, মহব্বতের শক্তিতে তার বিশ্বাসের সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই বাস্তববাদী রাজনীতিবিদরা—যারা বেড়ে উঠেছিলেন সুলতান বলবনের কঠোর কর্মকাণ্ডের মধ্যে—ফিরোজের আবেগী অভিব্যক্তি ও চাঞ্চল্যকর প্রতিচ্ছবি দেখে হতবাক হয়েছিলেন। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য রাজকীয় ক্ষমতার অত্যন্ত দক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। নতুন রাজবংশের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতাপ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ছিল এমন কাজ, যার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা কোনো বিলম্বিত কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিতে পারে না। এটা শুধু সেই কঠোর হৃদয়ের কাজ ছিল, যার মাধ্যমে সুলতান বলবন রাজ্যের শান্তি স্থাপনের জন্য সকলকে আনুগত্য করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে তার কঠোরতার নীতি সত্ত্বেও দিল্লির ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। মরহুম সুলতানের দুঃখজনক মৃত্যুতে মসনদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এজন্য এখন প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণের। বিপরীতে মানসিক কোমলতা একজন সুলতানের জন্য উপযুক্ত ছিল না; বিশেষ করে এমন একজন সুলতানের জন্য, যার প্রথম দায়িত্ব ছিল পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু করা।'

মালিক ছুজুর বিদ্রোহ

কিন্তু সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি অবিচল থাকেন তার হৃদয়ের আহ্বানের ওপর। এজন্য কয়েক দিনের ক্ষমতার অনিশ্চিত প্রতাপের জন্য মুসলমানদের রক্তপাত ঘটাতে এবং নিজের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কষ্টে ফেলতে তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই তার শান্তিপ্রিয়তা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে।

এই বছরের (১২৯০) আগস্ট মাসে মালিক ছুজু কিশলি খান—যিনি ছিলেন বলবনের ভাগনে এবং পুরোনো রাজপরিবারের প্রধান—কারা-তে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এর আগে মালিক ছুজু রাজপ্রতিনিধির পদ গ্রহণ করেছিলেন; যখন ফিরোজ শাহ খিলজিদের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত নস্যাৎ করেছিলেন এবং খুব অল্পবয়সি কাইমুর্সকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। এটা সম্ভব যে, ছুজু এই চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিলেন না; কিন্তু চক্রান্তের ব্যাপারে ছুজুর সহমর্মিতা স্বাভাবিক ছিল এবং এটা ফিরোজের কাছেও গোপন ছিল না। মালিক ছুজুর এই আশা ছিল, যদি সম্ভব হয় তাহলে তার চাচাতো ভাই বাগরা খানের—যিনি ১২৮৭ সালে বাংলায় স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন—সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বড় বিদ্রোহ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। ফখরউদ্দিন কোতওয়াল—যিনি নতুন শাসনব্যবস্থার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন না—মালিক ছুজু সম্পর্কে ফিরোজের দ্বিধা দূর করেন। ফলে মালিক ছুজুকে কারায় জায়গির দেওয়া হয় এবং অনুমতি দেওয়া হয় সুলতান বলবনের জীবিত সকল আত্মীয়কে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার।[৩]

ছুজু কারায় বিদ্রোহের পরিকল্পনা করতে থাকেন। আর জানা কথা, অযোধ্যার গভর্নর আমির আলি হাতেম খান এবং পুরোনো শাসনের অন্যান্য আমির, যারা পূর্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—অত্যন্ত জোশের সাথে তার সাথে যুক্ত হন। বলবনের খান্দান গঙ্গাপাড় অঞ্চলের হিন্দু সর্দারদের কাছ থেকেও ব্যাপক ছাড় পায়। রানা ও রাওয়াতাদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যা তাদের নিজস্ব সৈনিক ও তিরন্দাজদের সাথে নিয়ে ছুজুর পক্ষ অবলম্বন করে। রাওয়াতরা ছুজুর হাত থেকে 'পান' গ্রহণ করে; যা ছিল আনুগত্য ও বন্ধুত্বের আলামত। তারা গর্ব করে বলেছিল, তারা ফিরোজ শাহের রাজকীয় ছাউনি ভেঙে দেবে।[৪]

এ ধরনের সমর্থন ও এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে যে, 'রাজধানী ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো খিলজিদেরকে সঠিক উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করেনি' মালিক ছুজু নিজেকে সুলতান মুগিসউদ্দিন ঘোষণা করান, নিজের নামে

---

৩. তারিখে মুবারকশাহি, ৫৪-৫৯

৪. তারিখে ফিরোজশাহি, ১৮

মুদ্রা চালু করান, খুতবায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করান এবং নিজেকে মনে করতে থাকেন স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হিসেবে।

বিদ্রোহের ব্যাপক প্রস্তুতির খবর ছড়িয়ে পড়লে দোয়াব ও এর পাড়ের এলাকায় অবস্থানরত অফিসাররা বিচ্ছিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে অনিরাপদবোধ করেন এবং পশ্চিম দিকে ফিরে যেতে শুরু করেন। রাজধানী ও এর আশপাশের সমর্থকদের সমর্থনে এবং—ঐতিহাসিক বারানির ভাষায়—পিঁপড়া ও পঙ্গপালের মতো বিপুল সংখ্যক সৈন্যের ওপর ভরসা করে মালিক ছুজু দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৫]

সম্ভবত আমরুহার দিক থেকে শহরে পৌঁছার অভিপ্রায়ে তিনি গঙ্গার বাম তীর ঘেঁষে উত্তর দিকে অগ্রসর হন এবং হিদায়ানদের পথ ধরে গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হতে থাকেন; যেখানে তার দুই সমর্থক মালিক বাহাদুর ও আল্প গাজি নিজেদের সেনাবাহিনীসহ অপেক্ষায় ছিলেন তার আগমনের অপেক্ষায়।[৬]

এটা কোনো ভ্রুক্ষেপযোগ্য যুদ্ধের চাল ছিল না। অপরদিকে জালালউদ্দিন খিলজিও নিজের কোমলতা ও নমনীয়তার মাঝে এক উদ্যমী সৈনিক লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা যুদ্ধের পথে জাগিয়ে তুলতে পারত সেনাবাহিনীকে।

সুলতান তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খাননকে রাজধানীর দায়িত্বে রেখে বাহিনী সংগঠিত করেন এবং কোয়েল (আলিগড়) হয়ে বাদায়ুনের দিকে যাত্রা করেন; যাতে রোহিলাখণ্ডের পথ আটকে দেওয়া যায়। তিনি সিংহাসনের দাবিদার খুঁজে বের করতে এবং তাকে থামাতে নিজ পুত্র আরকুলি খানের অধীনে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। আরকুলি খান পিতার থেকে আগ বেড়ে আমরুহা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে পৌঁছেন, যারা অবস্থান নিয়েছিল গঙ্গার অন্য পাড়ে। শত্রুদের ছিনিয়ে নেওয়ার দরুন নৌকার অভাবে আরকুলি খান রাতে ভেলা ও ছোট নৌকাগুলোতে একটি ছোট বাহিনী পাঠিয়ে দেন।[৭] সফল আক্রমণ পরিচালিত হয়। শত্রুদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। যেমনটি আমির খসরু লিখেছেন, 'তারা তাঁবু ভেঙে ছুটে পালায় উত্তরে খেয়ালার পাহাড়ের দিকে।[৮]

আরকুলি খান দুদিন পর্যন্ত শত্রুদের তাঁবুতে লুটপাট চালান। এরপর দ্রুততার সাথে পিছু নেন পলাতক শত্রুসৈন্যদের। এরই মধ্যে যখন ফরখাবাদের কাছাকাছি ভোজপুরে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে সুলতান রোহিলাখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন—মিথ্যা সালতানাতের দাবিদার মালিক ছুজুর হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর

---

৫. তারিখে ফিরোজশাহি, ৭
৬. তারিখে মুবারকশাহি, ৬৩
৭. মিফতাহুল ফুতুহ, ১২-১৩
৮. প্রাগুক্ত, ১৩

কাছে—আরকুলি খান শত্রুদের তাড়িয়ে আনেন গঙ্গা পাড়ে। সারাদিন অত্যন্ত জোশের সাথে ছুজু ও তার বাহিনী লড়তে থাকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধের কোনো ফলাফল প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ছুজুর এক হিন্দু সমর্থক ভীমের এজেন্ট সংবাদ দেয়, 'পেছন দিক থেকে সুলতান জালালউদ্দিন আক্রমণ করবেন।' এই খবর শুনে ছুজুর পিলে চমকে ওঠে! সে তার কিছু সৈনিক নিয়ে তাঁবু ত্যাগ করেন। সকালে আরকুলি খান খুব সহজেই জয়লাভ করেন। ভীম ও আল্প গাজি নিহত হয়। মালিক মাসউদ ও বলবনকে বন্দি করা হয়। নেতাহীন হয়ে অন্যসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

কয়েকদিন পর ছুজুকেও একটি গ্রাম (সোয়াসি) থেকে গ্রেপ্তার করা হয়—যেখানে সে আত্মগোপন করেছিল। সেই গ্রামের সরদার ছুজুর পিছু নেওয়া সৈনিকদের হাতে তাকে ধরিয়ে দেয়।[৯]

সুলতান ফিরোজ—যিনি তখনও রোহিলাখণ্ডে ছিলেন—যখন আরকুলি খান বন্দিদের নিয়ে তার কাছে এসে পৌঁছেন তখন তিনি সারজো (ঘাঘরা) নদীর তীর দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর দিকে অগ্রসর হন, যাতে ইরান সরকারের স্থানীয় সমর্থকদের তিরস্কার করা যায় এবং ভারতের পথে ডাকাত ও যুদ্ধপলাতকদের নিশ্চিহ্ন করা যায়। এই অঞ্চলের কেউ কেউ—যেমন রুপালের সরদার—আনুগত্য স্বীকার করে। তাদের থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করা হয়। আর অন্যান্য সরদারের—যেমন কাহসানের সরদার—অঞ্চল লুণ্ঠন করা হয়। হিন্দু-বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেওয়া হয় আর ভারতীয় মুসলমানদের বিক্রি করা হয় গোলাম হিসেবে।[১০]

সুলতান ফিরোজের মহত্ত্ব

সুলতান ফিরোজ তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সৈনিকসত্তাকে দমিয়ে রেখে এমন উন্নত চরিত্র ও মহত্ত্বের প্রমাণ দিলেন, যা তার শত্রুদেরও লজ্জায় ফেলে দিলো। রোহিলাখণ্ডে অবস্থানের সময় তার সামনে বন্দি আমির ও মালিকদের আনা হয়। সুলতান যখন পরাজিত আমিরদের খালি মাথায় শেকল পরিহিত অবস্থায় এবং ধুলোমাখা পোশাকে মাঠ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলেন তখন তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন এবং নির্দেশ দিলেন, অতীত দিনের মতো বন্দিদের কাছে যেন কাপড় পৌঁছানো হয় এবং তাদের আপ্যায়ন করা হয়। এরও পরে তিনি আমির আলি ও অন্যান্য আমিরদেরকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে গোঁড়া রাজনীতিবিদদের অবাক করে দেন।

---

৯. তারিখে ফিরোজশাহি, ১৮৪

১০. মিফতাহুল ফুতুহ, ২১-২৩

সুলতান বলবনের পদ্ধতি অনুসারে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কারণে—কেননা সুলতান কঠোর কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি ছুজুকে সসম্মানে মুলতানে বন্দি করেন। তার সঙ্গীদের মুক্ত করে দেন—সালতানাতের আমির-উমারা জোর দাবি জানান সুলতানদের মতো কঠোরতা অবলম্বন ও কঠিন পাকড়াও করার। কিন্তু সুলতান ফিরোজ আবেগপ্রবণ ভঙ্গিতে স্বীকার করেন—তিনি জুলুম, সহিংসতা ও রক্তপাত দিয়ে শাসন পরিচালনা করতে অপারগ। তিনি এ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, তিনি তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এমন একজনের জন্য 'জায়গা' খালি করতে প্রস্তুত আছেন, যে তার নৈতিকতা পদদলিত করে 'মানুষ হত্যাকারী শাসন' কায়েম করতে চায়। তিনি জীবনের এই ক্রান্তিকালে এসে এই অভিজাতদের হত্যা বা অসম্মান করতে পারেন না। তিনি কি কখনো সেই দিনগুলো ভুলতে পারবেন, যখন তিনি নিজ ভাইয়ের সাথে অফিসারদের কাতারে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং খুব আগ্রহের সাথে প্রত্যাশা করতেন যে, হাতেম খান তাদের সালামের জবাব দেবেন! সম্ভব ছিল, তিনি এই জায়গায় থাকলে আজকের বিদ্রোহীরা তাকে এমন সুযোগ দিত না। কিন্তু এ কথার প্রেক্ষিতেও তিনি খুব সহজ উপায়ে এই যুক্তি পেশ করেন, 'মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানোর গুনাহ তখন তাদের দ্বারা হতো। আর আল্লাহ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন। আমি বিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাদের প্রতি দয়া করার মাধ্যমে করেছি। কেননা যা কিছুই হোক, তারা মানুষ ও মুসলমান। নিশ্চয় তারা দয়ার কদর করবে এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে বিরত থাকবে আমাকে আর কোনো ক্ষতি করা থেকে।'

পরবর্তীসময় একবারের জন্যও তার এই আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগেনি। কেননা, পরাজিত আমিরগণ তার আর কোনো ক্ষতি করেননি।

সুলতান ফিরোজের সামরিক অভিযান

রাজধানীতে প্রস্থানের পরপরই সুলতানকে আরেকটি সামরিক অভিযানে যেতে হয়। ঘটনাক্রম বর্ণনাকারীগণ যদিও বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ঐতিহাসিক আবদুল মালেক ইসামি ও তারিখে মুবারকশাহির লেখক মোঙ্গলদের যুদ্ধ ছুজুর বিদ্রোহের পরপরই সংঘটিত হয়েছে বলে একমত পোষণ করেছেন।

মুলতান সীমান্তে সানাম ও ইয়েপালপুর—যেখানে আরকুলি খান সবেমাত্র নিয়োগ পেয়েছিলেন—আবারও আবদুল্লাহ নামক এক মোঙ্গলের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আক্রমণ করে বসে।

ঐতিহাসিক বারানি আবদুল্লাহকে হালাকু খানের নাতি বলেছেন। আর মুবারকশাহিতে তাকে খুরাসানের শাহজাদার ছেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ—যিনি এই সীমান্ত-কমান্ডে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে আনন্দ পেতেন—নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হন।

জীবনব্যাপী অমুসলিমদের সাথে জিহাদে রত থাকায় তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর একবার তার স্ত্রীর কাছে 'মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ' উপাধিতে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি চান, কাজি ও শায়েখদের—যারা তার ছোট ছেলের বিবাহ উপলক্ষে মোবারকবাদ আসবেন—তাদের কাছে আবেদন করবেন, তারা যেন মানুষকে জানায়, মানুষ যেন সুলতানের কাছে অনুরোধ করে, এই উপাধি খুতবায় পাঠ করতে। কিন্তু যখন তিনি তা করলেন এবং কাজি ফখরউদ্দিন বাস্তবেই তাকে এই উপাধি গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন, তখন সুলতান অত্যন্ত অনাগ্রহের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি স্বীকার করলেন, তার এই উপাধি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু পরে আরও গভীর চিন্তাভাবনার পর মনে হয়েছে, তিনি এর যোগ্য নন।[১১]

ঐতিহাসিকদের মতে, যে জায়গাটিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার নাম 'বাররাম'।[১২] দুই পক্ষের অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে কয়েকদিন ছোটখাটো সংঘর্ষের পর—সংঘর্ষে সুলতানের বাহিনীর পাল্লা ভারী ছিল— মোঙ্গলরা বিনা লড়াইয়ে ফিরে যেতে সম্মত হয়। সুলতান ফিরোজ আবদুল্লাহকে—যাকে তিনি ছেলে সম্বোধন করেছিলেন—মোবারকবাদে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু একই সময় আবদুল্লাহ সীমান্ত পার হওয়ার সময় হালাকু খানের অন্য নাতি আলগুর নেতৃত্বে মোঙ্গলদের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেখানেই থেকে যায়। সুলতান আলগু খানকে হিন্দুস্তানে বসবাসের আমন্ত্রণ জানান; যেখানে তাকে বাড়ি, ভাতা ও সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয়।[১৩]

কিন্তু এরপর সাধারণ প্রশাসনিক কার্য পরিচালনাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যখন সুলতান তার প্রশস্ত হৃদয়ের প্রমাণ দেন চরম অপরাধীদের ক্ষমা করার মাধ্যমে; যাদের মধ্যে প্রমাণিত একহাজার অপরাধী ছিল খুন ও মহাসড়ক ডাকাতির অপরাধে জড়িত;[১৪] তাদের ভাগ্যের ওপর দয়া করে এবং অনুশোচনা ও প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়ে সুলতান তাদেরকে নৌকায় বোঝাই করে গঙ্গার দিকে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর লাখনৌয়ের সীমান্তে পৌঁছে এই খুনি ও ডাকাতদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

---

১১. তারিখে ফিরোজশাহি, ১৯২-৯৭

১২. ফুতুহুস সালাতিন, ২০৫, ফিরোজশাহি, ২১৮

১৩. তারিখে ফিরোজশাহি, ২১৯

১৪. ইতিহাসে এদেরকেই ঠগি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা ছিল চরম পর্যায়ের খুনি ও ডাকাত।—আহমাদ খান

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
১৮৫৭ সিপাহি বিপ্লবের ইতিবৃত্ত – মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান
ঈশা খাঁ – মহিম জোবায়ের
খিলজি শাসন – হুসাইন আহমাদ খান
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ

প্রকাশিতব্য কিছু বই

ঔপনিবেশিক ভারত – ইমরান রাইহান
ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি
তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ